ব্রিফিং নোট

মার্চ ২০২৪

৫

Funded by the European Union

Global Gateway

জনসম্পৃক্ত সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা

সংলাপ সম্পর্কে

এসডিজি'র মূল দর্শনই হচ্ছে কাউকে পেছনে ফেলে রাখা যাবে না। এ দর্শন বাস্তবায়নের জন্য যে কর্মকৌশল গ্রহণের কথা বলা হয়েছে তা হলো হোল অব সোসাইটি অ্যাপ্রোচ বা সমগ্র সমাজ পদ্ধতি। এসডিজি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ জাতীয় পর্যায় থেকে শুরু করে স্থানীয় ও তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এসব কর্মসূচিতে সম্পদ বরাদ্দ দেওয়া এবং তা ব্যবহারের প্রধানতম মাধ্যম হচ্ছে জাতীয় বাজেট। এই বাজেট মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা কতটা পূরণ করতে পারছে, তা নিয়ে তেমন আলোচনা হয় না। যাদেরকে উদ্দেশ্য করে বাজেটে অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়, তারা বাজেট থেকে সুফল পাচ্ছেন কি না এবং স্থানীয় পর্যায়ে থেকে এ বিষয়গুলোকে তারা কীভাবে মূল্যায়ন করছেন, তা সঠিকভাবে জানা জরুরি। বাজেটের আওতায় শিক্ষা বিষয়ে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হলেও সেগুলো আসলে যথাযথভাবে বরাদ্দের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে পারছে কি না, শিক্ষায় বিনিয়োগের সুফল টার্গেট গ্রুপ সঠিকভাবে পেল কি না, অঞ্চলভিত্তিক বৈষম্য রয়েছে কি না প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রেক্ষিতে সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) নীলফামারী জেলার ডিমলা উপজেলায় মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার ওপরে স্থানীয় প্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনের অংশগ্রহণে একটি জরিপ পরিচালনা করেছে। যার ফলাফল উপস্থাপনের লক্ষ্যে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম এবং ইকো সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) এর সহযোগিতায় স্থানীয় সমাজের নানা অংশীজনদের নিয়ে ২০২৩ সালের ১৭ জুন নীলফামারী জেলায় "প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা পরিস্থিতি: আমাদের করণীয়" শীর্ষক নাগরিক সংলাপ এর আয়োজন করে। সংলাপে নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, শিক্ষাবিদ, অভিভাবক, শিক্ষা উদ্যোক্তা, গণমাধ্যমকর্মীসহ সমাজের বিভিন্ন অংশ থেকে প্রায় দুই শতাধিক অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন এবং তাদের মূল্যবান মতামত উপস্থাপন করেন।

cpd.org.bd cpd.org.bd

cpdbangladesh CPDBangladesh

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)

বাড়ি ৪০/সি, সড়ক নং ১১ (নতুন), ধানমন্ডি
ঢাকা - ১২০৯, বাংলাদেশ
ফোন: (+৮৮ ০২) ৫৫০০১১৮৫, ৫৮১৫৬৯৮৩
ই-মেইল: info@cpd.org.bd

প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি স্থানীয় উদ্যোগও জরুরি

প্রারম্ভিক বক্তব্য

প্রারম্ভিক বক্তব্যে নাগরিক প্ল্যাটফর্মের আহ্বায়ক ও সিপিডির সম্মাননীয় ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, জনসম্পৃক্ত সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এই মুহূর্তে কী ধরনের চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান সে বিষয়ে আলোচনা করাই আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য। বিগত সময়ে অবকাঠামো খাতের পাশাপাশি শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক নিরাপত্তা খাতেও উন্নয়নের ছোঁয়া দেখা যায়। কিন্তু বাংলাদেশের প্রয়োজন এত বেশি যে, যেটুকু উন্নয়ন হয়, তা দিয়ে সবার প্রয়োজন মেটানো কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। উন্নয়নে কোথায় ঘাটতি থেকে যাচ্ছে তা যাচাই করার জন্য গত বছর নাগরিক প্ল্যাটফর্ম দেশের বিভিন্ন স্থানে সংলাপ করেছে। সেই সংলাপ থেকে আমরা জানতে পারি, উন্নয়নের যেসব ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়েছে তার মধ্যে এক নম্বরে রয়েছে মানসম্পন্ন শিক্ষা। বাংলাদেশকে যদি এসডিজি বাস্তবায়ন করতে হয় এবং মসৃণভাবে এলডিসি থেকে উত্তরণ ও উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে নিয়ে যেতে হয়, তাহলে শিক্ষার বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আমরা দেখছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় ১০ শতাংশ শিক্ষার্থীও পাস করতে পারে না। তার মানে এটি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার সমস্যা। এ বিষয়ে হাইস্কুল ও কলেজের শিক্ষকদের সঙ্গে আলাপ করলে তারা জানান, তারা প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে যে মানের শিক্ষার্থী পান, তাদের নিয়ে পরবর্তী পর্যায়ে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়। এমন পরিস্থিতিতে সবাই একমত হয়েছেন যে, প্রাথমিক শিক্ষা যদি সঠিকভাবে প্রদান করা না যায়, তাহলে ওই শিক্ষার্থীদের পক্ষে শিক্ষার পরবর্তী ধাপগুলোয় যথাযথ শিক্ষা অর্জন করা এবং সর্বোপরি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া কষ্টকর হয়ে পড়ে। এমন বাস্তবতায় আমরা প্রাথমিক শিক্ষার পরিস্থিতি জানতে তিনটি জায়গায় গবেষণা করেছিলাম। নীলফামারিতে আমরা যে গবেষণা করেছিলাম, তার ফলাফল আজ আপনাদের সামনে তুলে ধরা হবে।

শিক্ষার মানোন্নয়নে মিড ডে মিল চালু করা আবশ্যক

অভিভাবকরা জানান, স্কুলে বাচ্চাদের ক্ষুধা পায়। তাদের ক্ষুধা নিবারণের জন্য আগে সরকারের তরফ থেকে বিস্কুট বিতরণ করা হতো, কিন্তু এখন তা বন্ধ। এতে শিক্ষার্থীদের দীর্ঘসময় স্কুলে থাকতে কষ্ট হয়। পরিচালনা পর্ষদের একজন সভাপতি উল্লেখ করেন, আগে স্কুল ফিডিং কর্মসূচি ছিল। সম্প্রতি সময়ে এটি বন্ধ হয়ে গেছে যা শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার অন্যতম কারণ।

মিড ডে মিলের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি সিপিডি পরিচালিত গবেষণায়ও উঠে এসেছে। গবেষণার ফল অনুযায়ী, জরিপকৃত বিদ্যালয়সমূহ এবং অন্যান্য তথ্যপ্রদানকারী প্রত্যেকেই শিক্ষার্থীদের জন্য মিড ডে মিল চালু করার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেছেন। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর উপস্থিতি যেমন বাড়বে, তেমনি বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ার হারও কমবে। পুষ্টির চাহিদা অনেকাংশে পূরণের পাশাপাশি দরিদ্রতার কারণে বাল্যবিবাহের প্রবণতাও অনেক ক্ষেত্রে কমে আসতে মিড ডে মিলের ইতিবাচক ভূমিকা রয়েছে বলে জানিয়েছেন উত্তরদাতারা।

এ বিষয়ে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা নবেজউদ্দিন সরকার বলেন, যতদিন মিড ডে মিল চালু না হচ্ছে, ততদিন সরকারের আশায় বসে না থেকে শিশুদের মায়েরাই একটি ছোট বাটিতে করে কিছু খাবার দিয়ে দিতে পারেন, যেটি শিশুরা টিফিনে খেতে পারে। বিভিন্ন মা সমাবেশে আমি এ বিষয়টি তাদের বলেছি।

এ বিষয়ে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, বিদেশি সহায়তা ও সরকারের যৌথ উদ্যোগে মিড ডে মিলের একটি ব্যবস্থা ছিল। এখন সেটি বন্ধ হয়ে গেছে। সেটি হয়তো সরকারি উদ্যোগে ফের চালু হবে। যতদিন চালু না হচ্ছে, ততদিন একটি মধ্যবর্তী সমাধান হিসেবে অভিভাবক ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উদ্যোগ প্রয়োজন। তিনি বলেন, আমরা মনে করি, স্কুল ফিডিং কার্যক্রম দ্রুততার সঙ্গে চালু করা উচিত। এক্ষেত্রে কেবল সরকারের মুখাপেক্ষী না থেকে স্থানীয় ধনাঢ্য ও সামর্থ্যবান মানুষও এ কার্যক্রমে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিতে পারেন।

এ বিষয়ে উপজেলা চেয়ারম্যান তাবিবুল ইসলাম বলেন, ডিমলা এলাকায় অনেকগুলো গরুর খামার রয়েছে। এসব খামারের দুধ সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেই। ফলে খামারিরাও ন্যায্য দাম পায় না। এমন পরিস্থিতিতে খামারিদের কাছ থেকে দুধ সংগ্রহ করে স্কুলে শিশুদের খাওয়ানোর বিষয়ে আমরা উদ্যোগ নিয়েছি। এরইমধ্যে পরীক্ষামূলকভাবে একটি বিদ্যালয়ে এ কর্মসূচি চালু হয়েছে। প্রতিটি শিশুকে ২০০ গ্রাম দুধের একটি প্যাকেট দেওয়া হয়। এ কর্মসূচি যদি সফল হয়, তাহলে আমরা এটি পুরো ডিমলা উপজেলা ও নীলফামারী জেলায় ছড়িয়ে দিতে পারব।

বিদ্যালয়ের সীমানা প্রাচীর নির্মাণে ত্বরিত ব্যবস্থা নিতে হবে

অভিভাবকরা উল্লেখ করেন, অনেক স্কুলে খেলার মাঠ থাকলেও সীমানা প্রাচীর নেই। এতে করে শিশুদের নানা দুর্ঘটনায় পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। বিশেষ করে যেসব স্কুল গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ও বাজারের পাশে অবস্থিত, সেসব স্কুলে সীমানা প্রাচীর না থাকলে শিশুদের দুর্ঘটনায় পতিত হওয়ার ঝুঁকি বেশি।

এ বিষয়ে একজন শিক্ষক উল্লেখ করেন, বাজারের পাশে তার বিদ্যালয়ের অবস্থান। তার স্কুলে খেলার মাঠ থাকলেও সেটির সীমানা প্রাচীর নেই। এতে করে বাচ্চাদের বিষয়ে খুবই সতর্ক থাকতে হয়, কারণ তারা প্রচণ্ড ছোটাছুটি করে। এজন্য সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা দরকার। এছাড়া বৃষ্টি হলে মাঠে পানি জমে যায়। এই জলাবদ্ধতা নিরসনেও উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।

এ বিষয়ে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা বলেন, জেলা পর্যায় থেকে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের সীমানা প্রাচীর নির্মাণের রিকুইজিশন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে পাঠানো হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সব বিদ্যালয়ে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা হবে। তিনি উল্লেখ করেন, এক সময় বিদ্যালয় ভবন নির্মাণের তুলনায় সীমানা প্রাচীর নির্মাণ ব্যয় বেশি দেখানো হতো। সে কারণে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ পিছিয়ে গেছে। তবে এখন সেটির সমাধান করা হচ্ছে।

বিদ্যালয়ে অংক-ইংরেজি ভালো শেখানো হয় না

অভিভাবকরা জানান, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অংক ও ইংরেজি ভালোভাবে শেখানো হয় না। এতে শিক্ষার্থীরা ইংরেজি শব্দ ঠিকমতো বানান ও উচ্চারণ করতে পারে না এবং অংক করতে পারে না। এই ঘাটতি পূরণে তাদের প্রাইভেট পড়াতে হয়। অন্যসব বিষয়ের জন্যও প্রাইভেট পড়াতে হয়। যেসব বাচ্চারা এগুলো ঠিকমতো বুঝতে পারে না, তাদের বোঝানোর জন্য স্কুলের শিক্ষকরা তেমন উদ্যোগী হন না।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা এ বিষয়টি লক্ষ্য করেছেন বলে জানান। তিনি বলেন, প্রত্যন্ত এলাকার বিদ্যালয়গুলোয় এ সমস্যা বেশি। তিনি আরও বলেন বিদ্যালয় পরিদর্শনে গিয়ে এ বিষয়টি খেয়াল করেছেন যে, পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীরাও তাদের ইংরেজি বই পড়তে পারে না। এমনকি বাংলাও পড়তে পারে না বা গণিতও পারে না। তিনি জানান ধীরে ধীরে শিক্ষার মান বৃদ্ধি পাচ্ছে।

দাপ্তরিক কাজে ব্যস্ততার কারণে প্রধান শিক্ষকরা বিদ্যালয়ে কম সময় দেন

শিক্ষকরা জানান, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে নানা ধরনের দাপ্তরিক কাজে বিভিন্ন সময় বিদ্যালয়ের বাইরে অবস্থান করতে হয়। এতে বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম মনিটরিং করা কঠিন হয়ে পড়ে। যেসব বিদ্যালয়ে প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষকের সংখ্যা কম, সেখানে এই সমস্যা বেশি। তবে যেখানে পর্যাপ্ত শিক্ষক আছেন, সেখানে এই সমস্যাটি কিছুটা কম। দাপ্তরিক ও প্রশাসনিক কাজে প্রধান শিক্ষকের ব্যস্ততা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে বিদ্যালয়ে একজন অফিস সহকারী নিয়োগের সুপারিশ করেন বক্তারা।

প্রাইভেট টিউশনের প্রতি ঝোঁক বাড়ছে

গবেষণায় উঠে এসেছে যে, বেশ কিছু বছর ধরে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার বাইরে আরও অতিরিক্ত সময় প্রাইভেট টিউটরের নিকট পড়ার প্রবণতা তৈরি হয়েছে, যা অনেক ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যকীয় হয়ে উঠেছে। প্রাইভেট টিউটরের কাছে পাঠ না নিলে শিক্ষার্থীরা অপ্রত্যাশিত বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে পড়ে বলে প্রায়ই শোনা যায়। সেদিক থেকে আলোচ্য জরিপে এর অনেকটাই সত্য বলে প্রতীয়মান হয়েছে। এ বিষয়ে উত্তরদাতাদের মধ্যে ৫৫ শতাংশ ঐকমত্য পোষণ করেছেন এবং প্রায় ৯ শতাংশ মতামত প্রকাশে অপরাগতা জানিয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে অভিভাবক, শিক্ষার্থী, শিক্ষক, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ও শিক্ষা প্রশাসনের কর্মকর্তারা বিশেষ কিছু বলতে চাননি। শ্রেণিকক্ষে শিখন কার্যক্রমের নিম্নমান এবং প্রাইভেট টিউটরের নিকট পড়তে না পারার কারণে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার হারও সম্পূর্ণ বন্ধ করা যাচ্ছে না। বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কাছে টিউশনি করার চাপ বোধ করেন অনেকেই। এক্ষেত্রে বিদ্যালয়েই শিক্ষার মানোন্নয়নের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সরকারিভাবে দক্ষ শিক্ষকের ক্লাস ভিডিও রেকর্ড করে সব বিদ্যালয়ে প্রজেক্টরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

আলোচনায় অংশ নিয়ে এ বিষয়ে শিক্ষকরা বলেন, গবেষণা প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫৫ শতাংশ শিক্ষার্থী মনে করে তাদের প্রাইভেট পড়া উচিত। এ পর্যায়ে যদি এত বড় একটি অংশ এমন চিন্তা করে, তাহলে হাইস্কুলে সেটি শতভাগ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ বিষয়টি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য অশনি সংকেত। শিক্ষার্থীরা ক্লাসমুখী না হয়ে প্রাইভেটমুখী হয়ে পড়ছে। এতে অভিভাবকদের ওপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি হচ্ছে।

এ বিষয়ে শিক্ষকরা বলেন, স্কুলে যে-সংখ্যক শিক্ষার্থী রয়েছে, তার তুলনায় শিক্ষকের সংখ্যা কম, যে কারণে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও দুর্বল শিক্ষার্থীদের প্রতি শিক্ষকরা বাড়তি মনোযোগ দিতে পারেন না। এজন্য তাদের প্রাইভেট পড়তে হয়। যদি প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া যায়, তাহলে হয়তো আর প্রাইভেট পড়া লাগবে না।

অবকাঠামোগত ঘাটতি দূরীকরণে পদক্ষেপ নিতে হবে

শিক্ষকরা আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন, অনেক বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত সংখ্যক শ্রেণিকক্ষ নেই। ফলে দুই শিফটে বিদ্যালয় পরিচালনা করতে হয়। আর সরকার পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ভবন নির্মাণ করলেও সেটা খুবই ধীর গতিতে হচ্ছে। এতে বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম বিঘ্নিত হচ্ছে। শিক্ষকরা জানান, প্রায় প্রতিটি গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। কিন্তু গ্রামাঞ্চল হওয়ায় বিদ্যালয়ের সংযোগ সড়কগুলো উন্নত মানের নয়। বিশেষ করে বর্ষাকালে সড়কগুলো চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। তখন বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি কমে যায়। এজন্য স্কুলের সংযোগ সড়কগুলো বছরের সবসময় চলাচলের উপযোগী করে তোলা আবশ্যক।

শিক্ষা অবকাঠামো, শিক্ষা উপকরণ ও দক্ষ শিক্ষকের অভাব শিক্ষার্থীদের মানসম্মত শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে অন্যতম অন্তরায়। বিশেষ করে ডিজিটাল শিক্ষা ও পাঠ্যক্রম বহির্ভূত শিক্ষা। ডিজিটাল শিক্ষা কার্যক্রম উপকরণ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দক্ষ জনবল নিশ্চিত করতে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে বিদ্যালয়ভিত্তিক পরিকল্পনা করতে হবে। পাঠ্যক্রম বহির্ভূত শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ দেওয়া প্রয়োজন।

আলোচকরা বলেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে এখনো পর্যাপ্ত অবকাঠামো এবং প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। প্রতিটি ক্লাসে ছাত্র-ছাত্রীর গড় সংখ্যা বিবেচনায় নিয়ে শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ, বিদ্যমান শ্রেণিকক্ষের সংস্কার, শ্রেণিকক্ষে বৈদ্যুতিক পাখা ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুতের ব্যবস্থা এবং পাঠ উপকরণ সরবরাহ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে প্রতিটি বিদ্যালয়ে সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প নেওয়া যেতে পারে।

উপবৃত্তির অর্থ পাওয়া নিয়ে জটিলতা

মোবাইল ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি দেওয়া হয়। এ প্রক্রিয়ায় বিদ্যালয়ের শিক্ষক বা বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। কিন্তু অধিকাংশ সময় দেখা যায়, শিক্ষার্থীরা ঠিকমতো উপবৃত্তি পাচ্ছে না। এ ব্যাপারে তারা প্রধান শিক্ষকের কাছে অভিযোগ করে। কিন্তু প্রধান শিক্ষকের এ বিষয়ে কিছুই করার নেই। এই জটিলতা নিরসনের জন্য শিক্ষকরা জোর দাবি জানান।

একটি বিদ্যালয়ের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি বলেন, শিশুদের মাসিক ৭৫ থেকে ১৫০ টাকা পর্যন্ত উপবৃত্তি দেওয়া হয়। এটি খুবই নগণ্য। শিশুদের পারিবারিক শিশুশ্রম থেকে নির্বৃত্ত করতে হলে এই উপবৃত্তির পরিমাণ বাড়াতে হবে।

এ বিষয়ে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা বলেন, নীলফামারীতে শতভাগ শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি দেওয়া হয়। এখন সেটি মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে দেওয়া হচ্ছে। তবে অনেক সময় মোবাইল নম্বর ভুল হওয়া বা অন্যান্য জটিলতার কারণে বৃত্তি পেতে দেরি হয়। তবে সেসব সমস্যার সমাধানও হয়। উপবৃত্তির এমন জটিলতা হলে তা উপজেলা শিক্ষা অফিসে জানাতে হবে। আর বৃত্তির পরিমাণ বাড়ানোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এটি একটি জাতীয় ইস্যু। এই বার্তা আমরা সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পৌঁছে দেব। তবে সবকিছু সরকার করবে, এমন মনোভাব থেকে বেরিয়ে এসে আমাদেরও দায়িত্ব নিতে হবে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের বেতন-ভাতা বাড়ানো উচিত

আলোচকরা বলেন, অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশে শিক্ষকদের বেতন কম। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন-ভাতা হাইস্কুল ও কলেজের শিক্ষকদের তুলনায় বেশি হওয়া উচিত বলে তারা মনে করেন। তাদের জন্য পৃথক বেতন কাঠামো থাকা উচিত বলে কেউ কেউ মন্তব্য করেন। তারা বলেন যে, শিক্ষকদের বেতন বেশি দিতে হবে, যাতে শিক্ষাজীবনে যারা ভালো ফলাফল অর্জন করেন, তারা শিক্ষকতা পেশায় আসতে আগ্রহী হন।

এ বিষয়ে উপজেলা চেয়ারম্যান তাবিবুল ইসলাম বলেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা যে পরিমাণ মেধা ও শ্রম ব্যয় করেন, সেই তুলনায় তাদের বেতন-ভাতা অনেক কম। এটি বাড়ানোর বিষয়ে নীতি নির্ধারকরা উদ্যোগ নেবেন বলে আমাদের বিশ্বাস।

শিক্ষকরা নিজেদের ছেলেমেয়েকে কিন্ডারগার্টেনে পড়ান

আলোচকরা বলেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা নিজেরা ইতাদের সন্তানদের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ান না। তারা তাদের ছেলেমেয়েদের কিন্ডারগার্টেন স্কুলে পাঠান। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার মান খারাপ হওয়ার পেছনে এটিও একটি কারণ বলে তারা উল্লেখ করেন।

এ বিষয়ে মণিশঙ্কর দাশগুপ্ত বলেন, কিন্ডারগার্টেনে সফলতার পুরো কৃতিত্ব কি সেই স্কুলের শিক্ষক ও পরিচালনা পর্ষদের? সেসব স্কুলে শিশুকে কী কী কাজে নিয়োজিত করতে হবে, সে বিষয়ের ওপর অভিভাবককে ডায়েরি ধরিয়ে দেওয়া হয়। সুতরাং পুরো কাজটি কিন্তু অভিভাবকরাই করছেন। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অভিভাবকরা এতটা সচেতন নন। সেজন্য সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষার মানের বিষয়ে শিক্ষকদের পুরোপুরি দায়ী করা যৌক্তিক নয়। এক্ষেত্রে শিক্ষার মান ঠিক রাখার জন্য সরকার-নির্ধারিত সিলেবাসের বাইরে যাতে কোনো বই পড়ানো না হয়, সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। এটি ইবতেদায়ী, প্রাইমারি ও কিন্ডারগার্টেন সকল ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হবে। সরকার-নির্ধারিত বইয়ের বাইরে কিন্ডারগার্টেন শিশুদের কোনো বই দেওয়া যাবে না।

শিশুদের সিলেবাসের বিষয়ে এক আলোচক বলেন, তাদের পাঠ্যক্রমে বিজ্ঞান পরিচিতি, সমাজ পরিচিতি প্রভৃতি বিষয় থাকলেও মানুষের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের বিষয়ে ধারণা দেওয়ার মতো কোনো বিষয় নেই। ফলে তারা নিজেদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন হতে পারে না। কাজেই এ ধরনের বিষয় তাদের পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

বিদ্যালয়ের জন্য বরাদ্দের অর্থ পেতে ঘুষ দিতে হয়

বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির এক সদস্য উল্লেখ করেন, সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যে অর্থ বরাদ্দ দেয়, তা সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয় না। এ অর্থের বড় একটি অংশ ঘুষ হিসেবে ব্যয় হয়। শিক্ষা প্রশাসনে বড় বাবু ছোট বাবু আছেন। তারাই এ অর্থ ঘুষ হিসেবে নেন বলে প্রধান শিক্ষকরা জানিয়ে থাকেন। এই অর্থের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটিসহ সংশ্লিষ্ট অন্যদের মাধ্যমে মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে।

যোগ্য ব্যক্তির মাধ্যমে বিদ্যালয় পরিচালনায় গুরুত্বারোপ

বক্তারা উল্লেখ করেন, সরকার নিয়ম করেছে যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরিচালনা পর্ষদের সদস্য হতে হলে ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা হতে হবে স্নাতক পাস। কিন্তু তাতেও গুণগত পর্ষদ গঠন নিশ্চিত হচ্ছে না। কারণ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যদি শিক্ষানুরাগী না হন বা কৃষিকাজ ও ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি হন, তাহলে শিক্ষা সম্পর্কে তার ধারণা কম থাকে। এমন পরিস্থিতিতে তারা বিদ্যালয়ের শিক্ষার উন্নয়নে তেমন ভূমিকা রাখতে পারেন না। এমনকি বর্তমানে শিক্ষার্থীর অভিভাবকরাও নকলের মতো অসদুপায় অবলম্বনের মাধ্যমে শিশুদের ভালো ফলাফল করানোর বিষয়টিকে উৎসাহিত করছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। বিভিন্ন সময় গণমাধ্যমেও এমন বিষয় উঠে এসেছে বলে আলোচকরা জানান।

স্যানিটারি বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

সচেতন নাগরিক কমিটির (সনাক) এর সভানেত্রী জাহানারা রহমান ডেইজি বলেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির মেয়েরা বয়ঃসন্ধিকালে প্রবেশ করে এবং তাদের ঋতুচক্র শুরু হয়। এ পরিস্থিতিতে তাদের জন্য কাউন্সেলিং প্রয়োজন। পাশাপাশি তাদের জন্য স্যানিটারি ন্যাপকিন ও সেগুলোর ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

শিশুশ্রম ও ঝরে পড়া রোধে করণীয়

গবেষণা প্রতিবেদনে সিপিডি'র সিনিয়র রিসার্চ ফেলো তৌফিকুল ইসলাম খান বলেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এখনো উল্লেখযোগ্য হারে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ছে। সামাজিকভাবে শিশুশ্রম ও বাল্যবিবাহ দূরীকরণের উদ্যোগ নিতে হবে এবং ঝরে পড়ার হার কমাতে হবে। ঝরে পড়া রোধে যেসকল এলাকায় দারিদ্র্যের হার বেশি, সেসকল এলাকায় উপবৃত্তির পরিমাণ বাড়াতে হবে।

শিক্ষকরা জানান, ধান ও ভুট্টার মাড়াই মৌসুমে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী উপস্থিতি কমে যায়। কারণ ওই সময় শিশুরা তাদের পরিবার কর্তৃক শিশুশ্রমে নিযুক্ত হয়। এ বিষয়ে একজন সরকারি উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা বলেন, নীলফামারী দারিদ্র্যপীড়িত এলাকা হওয়ায় এখানকার মানুষ জীবিকার তাগিদে এলাকার বাইরে অবস্থান করেন। এ সময় তারা শিশুদের বিকল্প কোনো অভিভাবক, যেমন দাদি-নানির কাছে রেখে যান। এর ফলে ওই শিশুদের শিক্ষার বিষয়ে গুরুত্ব কমে যায়। বিকল্প অভিভাবকরা শিশুদের বিদ্যালয়ে পাঠানোর বিষয়ে খুব বেশি জোর দিতে পারেন না সংগত কারণেই। এজন্য ঝরে পড়ার হার বৃদ্ধি পায়। এছাড়াও এসব শিশুরা ফসল মাড়াই মৌসুমে শিশুশ্রমে নিয়োজিত হয়।

এ বিষয়ে জাহানারা রহমান বলেন, নীলফামারী এলাকার মানুষ নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠী, যে কারণে তারা তাদের ছেলেমেয়েদের শিশুশ্রমে নিযুক্ত করেন। জেলার যে উপজেলায় এই গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়েছে, সেটি সীমান্তবর্তী উপজেলা। এখানে দারিদ্র্য, কুসংস্কার, অশিক্ষা, ভূমিবিরোধসহ নানা সমস্যা বিদ্যমান। এমন পরিস্থিতিতে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অসন্তুষ্টির জায়গাগুলো চিহ্নিত করে তা সমাধানে জাতীয়ভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

তিনি জানান, প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর সঙ্গে সমন্বিতভাবে সনাক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার মনিটরিংয়ে অংশ নেয়, মা সমাবেশ আয়োজন করে এবং বিদ্যালয়ে অভিযোগ বাক্স স্থাপনের মাধ্যমে বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করে। ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার কারণ অনুসন্ধান করতে সনাক ও টিআইবির সংশ্লিষ্ট কমিটি মায়েদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে তাদের আবার বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেয়।

নবেজ উদ্দিন সরকার বলেন, নীলফামারী জেলায় ঝরে পড়ার হার ৩.১ শতাংশ। এক্ষেত্রে ডিমলা উপজেলার ঝরে পড়ার হার বেশি। চর ও দারিদ্র্যপ্রবণ এলাকা হওয়ায় সেখানে ঝরে পড়ার হার বেশি।

পিটিআই প্রশিক্ষণ জোরদার করতে হবে

একটি পিটিআই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ জানান, ২০২৩ সালের জানুয়ারি থেকে দেশের ৬৭টি পিটিআই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ বন্ধ রয়েছে। নতুন অর্থবছরে ২৫টি পিটিআইতে কারিকুলাম হালনাগাদকরণের বিষয়ে প্রশিক্ষণ শুরু হবে। কিন্তু বাকিগুলোয় সে প্রশিক্ষণ হবে না। এমন পরিস্থিতিতে প্রশিক্ষণ না হওয়া এলাকাগুলো পিছিয়ে থাকবে। তাই তিনি সব পিটিআইতে প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নেওয়ার ওপর তাগিদ দেন।

শিক্ষার মানোন্নয়নে শিক্ষকদের আরও আন্তরিক হতে হবে

আলোচনায় অংশ নিয়ে একজন শিক্ষক জানান, তিনি ছাত্রাবস্থায় কিন্ডারগার্টেন স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। তখন তার স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পর্যায়ের কোনো ডিগ্রি ছিল না। কিন্তু ওই স্কুলের পরিচালক বা কর্তা ব্যক্তিদের কঠোর মনিটরিংয়ের ফলে ছেলেমেয়েদের পড়ালেখা ভালো হতো। সে কারণে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও নিজেদের ছেলেমেয়েদের নিজ স্কুলে না পড়িয়ে কিন্ডারগার্টেনে পড়াচ্ছেন। সরকারি স্কুলে স্নাতকধারী ও মেধাবী শিক্ষক নিয়োগ দেওয়ার পরও সেখানে শিক্ষার মান খারাপ হচ্ছে। এজন্য তিনি শিক্ষকদের আন্তরিকতার ঘাটতি ও মনিটরিংয়ের দুর্বলতাকে দায়ী করেন। অভিভাবকরাও শিক্ষকদের আন্তরিকতার ঘাটতির বিষয়টি তুলে ধরেন।

এ বিষয়ে নীলফামারী সরকারি কলেজের সহযোগী অধ্যাপক মণিশঙ্কর দাশগুপ্ত বলেন, আজকের আলোচনায় শিক্ষকদের আন্তরিকতার বিষয়ে অনেক বেশি আলোচনা হয়েছে। এক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের টানা পাঁচটি ক্লাস নিতে হয়। এ বিষয়টি মানসম্পন্ন শিক্ষার জন্য সহায়ক নয়। শিক্ষকদের ওপর চাপ অনেক বেশি। ক্লাসের ফাঁকে বিরতি দরকার।

শিক্ষার মানোন্নয়নে তদারকি কার্যক্রম জোরদার করতে হবে

গবেষণা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, শিক্ষা কার্যক্রম তদারকি, শিক্ষা কার্যক্রমে স্থানীয় জনগণ ও অভিভাবক প্রতিনিধিদের সক্রিয় অংশগ্রহণ না থাকা এবং অনেকক্ষেত্রে দুর্গম যোগাযোগ ব্যবস্থা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত করে চলেছে। শিক্ষা কার্যক্রম, শিখন অগ্রগতি মূল্যায়ন ও শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি, অভিভাবক প্রতিনিধি, সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি এবং নারীদের অংশগ্রহণের অনুপাত বাড়ানো প্রয়োজন। শিক্ষা কার্যক্রমে নতুনত্ব, সৃজনশীল বিভিন্ন শিক্ষা পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা নিতে স্থানীয়ভাবে কর্মরত বেসরকারি উন্নয়ন সংগঠন, মিডিয়া ও শিক্ষা গবেষকদের যুক্ত করা প্রয়োজন।

এ বিষয়ে মণিশঙ্কর দাশগুপ্ত বলেন, শিক্ষা কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও শিক্ষকদের তদারকির ক্ষেত্রে যেসব কর্মকর্তা দায়িত্ব পালন করেন, তাদের মধ্যে এক ধরনের প্রভুসুলভ আচরণ পরিলক্ষিত হয়। এর ফলে শিক্ষকদের সঙ্গে কর্মকর্তাদের কিছুটা দূরত্ব দেখা যায়। এক্ষেত্রে প্রাথমিক বিদ্যালয় মনিটরিংয়ের জন্য যেসব কর্মকর্তা দায়িত্ব পালন করেন, বাস্তবতা বোঝার জন্য প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অন্তত চার মাস তাদের শিক্ষকতা করতে দেওয়া যেতে পারে।

তিনি আরও বলেন, রাজধানী শহর, বিভাগীয় শহর, জেলা শহর, উপজেলা শহর ও গ্রাম – এ সকল স্তরে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর অবস্থান। কাজেই সর্বস্তরের বিদ্যালয়ের উন্নয়নের জন্য একই ধরনের উদ্যোগ বাস্তবসম্মত নয়। কারণ সব জায়গায় একই ধরনের শিক্ষার্থী পড়ালেখা করে না। বিদ্যালয়ের স্থানভেদে ভিন্ন ভিন্ন পরিকল্পনা সাজাতে হবে।

ভালো ফলাফলের প্রতিযোগিতার কারণে বাড়ছে প্রাইভেট টিউশনের প্রবণতা

ইএসডিও-র নির্বাহী পরিষদের সদস্য আখতারুজ্জামান বলেন, প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে গাইবান্ধা, ঠাকুরগাঁও ও নীলফামারী তিনটি সংলাপেই প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নের বিষয়ে প্রায় একই রকম কথা এসেছে। সবখানে প্রাইভেট টিউশনের বিষয়ে কথা এসেছে। তবে টিউশনের বিষয়টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তুলনায় হাইস্কুলে বেশি। তিনি বলেন, জিপিএ-৫ পাওয়া নিয়ে আজকাল প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। সব অভিভাবক তার সন্তানের ভালো ফলাফল দেখতে চান। সেই চিন্তা থেকে তারা ছেলেমেয়েদের অনেকগুলো টিউশনের ব্যবস্থা করেন। এর ফলে ভালো ফলাফল অর্জিত হচ্ছে হয়তো, কিন্তু এসডিজি-৪ এ যে মানসম্পন্ন শিক্ষার কথা বলা হয়েছে, সেই শিক্ষা অর্জিত হচ্ছে না। তার প্রমাণ হচ্ছে শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় পাস করতে পারছে না। তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় ৯০ শতাংশ শিক্ষার্থী ফেল করেছে। তাহলে মানসম্পন্ন শিক্ষা অর্জিত হচ্ছে কোথায়? তিনি বলেন, প্রাথমিক শিক্ষা হচ্ছে মৌলিক শিক্ষা। কাজেই এ স্তরে শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত হতেই হবে। একটি বিষয় উঠে এসেছে যে, পঞ্চম শ্রেণি উত্তীর্ণ হওয়ার পরও শিক্ষার্থীরা ইংরেজি পড়তে পারে না। এক্ষেত্রে হাইস্কুলের শিক্ষকরা প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং কলেজের শিক্ষকরা হাইস্কুলকে দোষারোপ করে। এভাবে দায় চাপিয়ে কোনো লাভ হবে না। এক্ষেত্রে কী ধরনের ঘাটতি আছে, তা খতিয়ে দেখতে হবে।

নৈতিক শিক্ষার ওপর জোর দিতে হবে

আখতারুজ্জামান বলেন, আমরা কি শুধু শিক্ষার্থীদের ভালো ফলাফলের বিষয়েই গুরুত্ব দিব নাকি শিক্ষার্থীরা একজন ন্যায়পরায়ণ মানবিক মানুষ হিসেবে গড়ে উঠছে কি না, সে বিষয়টিও দেখব? শিক্ষার্থীরা এসব গুণাবলি অর্জন করছে কি না, তা এই গবেষণায় উঠে আসেনি। এক্ষেত্রে নৈতিক শিক্ষার বিষয়টিতেও গুরুত্ব দিতে হবে।

করোনাকালের শিখন ক্ষতির প্রভাব এখনো বিরাজমান

আখতারুজ্জামান উল্লেখ করেন, গবেষণায় উঠে এসেছে যে, করোনাকালে প্রাথমিক বিদ্যালয় অনেক দিন বন্ধ ছিল। এ সময়ে অনেক শিক্ষার্থী হয় মাদ্রাসায় চলে গেছে, অথবা ঝরে পড়েছে। এটি কেন হলো তা খতিয়ে দেখার দরকার রয়েছে।

এ বিষয়ে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা বলেন, করোনার কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম। কারণ আমরা ডিভাইস বুঝি না, অনেকের স্মার্ট ডিভাইস নেই। আবার ছোট শিশুদের ডিভাইসের মাধ্যমে শিক্ষাদান করাও জটিল। এর ফলে অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রম ফলপ্রসূ হয়নি। এসব কারণে কোভিডে প্রাথমিক শিক্ষা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কোভিডে যে ক্ষতি হয়েছে, তা পুষিয়ে নিতে সময় লাগছে।

কোভিড সময়কালে শিখন ক্ষতি বিবেচনা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষত প্রান্তিক ও অসুবিধাগ্রস্ত পরিবারের সন্তানদের ক্ষতির পরিমাণ বেশি। কিন্তু এখনো বিদ্যালয় পর্যায়ে বিশেষ কোনো কার্যক্রম নেই। এক্ষেত্রে দুর্বল ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিশেষ ক্লাসের ব্যবস্থা করতে হবে এবং শিক্ষকদের সরকারিভাবে যথাযথ আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

সার্বিকভাবে সরকারি অনুদান খরচের ক্ষেত্রে সাধারণ সভার মাধ্যমে বছরের শুরুতে এবং শেষে বাজেট পরিস্থিতি ও মতামত সংগ্রহে বিদ্যালয় কমিটি উন্মুক্তসভা আয়োজন করতে পারে, যেখানে জনপ্রতিনিধি, সরকার-সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং সাধারণ জনগণ বিশেষত অভিভাবকরা অংশগ্রহণ করতে পারেন। এতে সামাজিকভাবে বিদ্যালয়ের কার্যক্রমে স্থানীয় অংশীদারিত্ব ও মালিকানা উন্নত হবে।

গুণগত শিক্ষার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য এখনো অর্জিত হয়নি

প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা বলেন, আগে প্রাথমিক শিক্ষার প্রতিপাদ্য ছিল ‘সবার জন্য শিক্ষা’। এখন সেই প্রতিপাদ্য পরিবর্তিত হয়ে চালু হয়েছে ‘সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা’। ১৯৪৮ সাল থেকে এ পর্যন্ত শিক্ষা-বিষয়ক যতগুলো আইন ও বিধি-বিধান প্রণীত হয়েছে, তার সবগুলোয় সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন, অবকাঠামোগত সমস্যার বিষয়টি উঠে এসেছে। তবে আমরা যদি শতবর্ষ আগের সঙ্গে তুলনা করি, তাহলে বলতে হবে যে, সে সময়ের তুলনায় অবকাঠামো যথেষ্ট এগিয়েছে। কিন্তু গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে আমরা এখনো কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারিনি। কেন পৌঁছাতে পারিনি, সেই আলোচনাই এখন হচ্ছে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্য রোধে পদক্ষেপ নিতে হবে

শিক্ষা ও মেধা ছাড়া দেশ এগোতে পারবে না। সেজন্য মেধা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে কাজ করে যেতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়ে এখানে যে আলোচনা হয়েছে, তা অত্যন্ত বাস্তবভিত্তিক। বাস্তবতা মানুষকে

অনেক শিক্ষা দেয়। এখান থেকে আমরা উপলব্ধি করতে পারছি যে, বৈষম্যের কারণে আমরা অনেক পিছিয়ে যেতে পারি। ডিমলা উপজেলা শিক্ষক পাওয়ার ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার। অনেক বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষক নেই। উপজেলায় এখনো ১৮১টি শূন্য পদ রয়েছে। তিনি বলেন, ডিমলা উপজেলার সাতটি ইউনিয়ন তিস্তা নদী বিধৌত। ওইসব ইউনিয়নে পাঁচটি প্রাথমিক বিদ্যালয় চরাঞ্চলে অবস্থিত। বন্যার সময় চরাঞ্চলের এসব বিদ্যালয়ে পড়ালেখা বন্ধ থাকে। গত বছরের বন্যায় চরাঞ্চলের কিছু বিদ্যালয়ের ভবন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তিনি বলেন, বৈষম্যের কারণে দেশ স্বাধীন হয়েছে। আর এখন দেশের কোনো অঞ্চল যদি পিছিয়ে যায়, তাহলে বৈষম্যের কারণেই পিছাবে। মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ বাস্তবায়ন করতে হলে বৈষম্য দূর করতে হবে।

শিক্ষক বদলি ও অর্থ বরাদ্দ ঢাকায় কেন্দ্রীভূত

উপজেলা চেয়ারম্যান উল্লেখ করেন, অনেক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী কম, শিক্ষক বেশি। আবার অনেক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী বেশি, শিক্ষক কম। যে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী বেশি, সেখানে কম শিক্ষার্থী থাকা বিদ্যালয় থেকে একজন শিক্ষককে বদলি করার এখতিয়ার জেলা শিক্ষা অফিসারেরও নেই। এ বিষয়টিও অধিদপ্তরের হাতে ন্যস্ত। ফলে শিক্ষকদের যথোপযুক্ত বণ্টন করা সম্ভব হচ্ছে না।

তিনি বলেন, সকল ধরনের সিদ্ধান্ত ঢাকায় কেন্দ্রীভূত। আমাদের একটি বিদ্যালয়ের উন্নয়নের বিষয়ে ঢাকায় বসে প্রাক্কলন করা হয়েছে। সেই প্রাক্কলনে স্থানীয় প্রয়োজনাদির অনেক কিছুই অন্তর্ভুক্ত হয়নি। পরে ইঞ্জিনিয়ার সেগুলো সংশোধন করে পাঠিয়েছেন। সেটি অনুমোদন হওয়ার পর সেই ভবন তৈরি হয়েছে। কিন্তু এই আমলাতান্ত্রিকতার মধ্যে অনেক সময় পার হয়ে গেছে। কাজেই ঢাকায় বসে ডিমলা উপজেলার পরিকল্পনা করলে হবে না।

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর অনুকূল অবকাঠামোর অভাব

গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপনকালে তৌফিকুল ইসলাম খান বলেন, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এখনো বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে অবকাঠামো ও দক্ষ মানবসম্পদ নেই। পর্যায়ক্রমে এ বিষয়ে সক্ষমতা তৈরি করতে হবে। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীদের কথা মাথায় রেখে প্রতিটি বিদ্যালয়ে র‍্যাম্প তৈরি করতে হবে।

র‍্যাম্পের বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা বলেন বলেন, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের সুবিধার্থে নতুন বিদ্যালয়গুলোয় র‍্যাম্প তৈরি করা হচ্ছে। তবে পুরোনো বিদ্যালয় ভবনে র‍্যাম্প নেই। তিনি উল্লেখ করেন, আমরা সমাজেই প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে রেখেছি। তিনি স্বীকার করেন, বিদ্যালয় ভবনে নিচতলায় ওঠার জন্য র‍্যাম্পের ব্যবস্থা থাকলেও দোতলা বা তিনতলায় ওঠার জন্য সে ব্যবস্থা নেই। ফলে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা দোতলা বা তিনতলা শ্রেণিকক্ষে ক্লাস করতে যেতে পারে না। আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো এখনো শতভাগ প্রতিবন্ধীবান্ধব নয়। তবে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা কীভাবে করতে হবে, সে বিষয়ে কর্মকর্তা ও প্রধান শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ রয়েছে।

উপসংহার

জাহানারা রহমান ডেইজি বলেন, স্মার্ট বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা ও এসডিজি অর্জনে কাজ করছে সরকার ও বিভিন্ন সংস্থা। এসব বিষয় অর্জন করতে হলে সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোকে তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে হবে এবং তথ্য-প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে জনপ্রতিনিধি, নাগরিক প্রতিনিধি ও বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সমন্বয়ে আরও বেশি মনিটরিং প্রয়োজন। দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে এবং বৃত্তির পরিমাণ বাড়াতে হবে।

পরিশেষে এমন একটি সংলাপের জন্য শিক্ষাকে বেছে নেওয়ার কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে সিপিডি'র সম্মাননীয় ফেলো ও নাগরিক প্ল্যাটফর্মের কোর গ্রুপ সদস্য অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ের নিরিখে অন্তত একটি বিষয়ে আমরা একমত হব যে, দেশে আগের প্রজন্মের তুলনায় পরের প্রজন্ম আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন সূচকে ভালো অবস্থানে আছে। এটি আমাদের একটি গৌরব ও অহংকারের জায়গা। অর্থাৎ ধারাবাহিকভাবে একটি উন্নতির মধ্য দিয়ে আমরা আজ এই জায়গায় পৌঁছেছি। তবে আগামী দিনে বাংলাদেশের পথচলা সেই সরলরেখায় চলবে। কারণ দেশে ধন-বৈষম্য ও আয়-বৈষম্য ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। এই বৈষম্য বর্তমানে প্রকট হয়ে উঠছে। আর এ বৈষম্যের অন্যতম কারণ হলো বিদ্যমান শিক্ষা ব্যবস্থা। শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে একটি বড় ধরনের ব্যবধান সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে। বিশ্ব এখন চতুর্থ শিল্প বিপ্লবকালীন সময় অতিবাহিত করছে। এমন পরিস্থিতিতে এখন আমরা যেসব কর্ম সৃষ্টি করছি, তার একটা বড় অংশই আগামী ১৫ বছরের মধ্যে থাকবে না। কাজেই আগামীর চাহিদার উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে না পারলে সামনের দিনে অগ্রগতি অব্যাহত রাখা কঠিন হবে। আগামী দিনের শ্রমবাজারের জন্য আমরা আমাদের ছেলে-মেয়েদের প্রস্তুত করতে পারছি কি না, সেটি একটি বড় প্রশ্ন।

তিনি উল্লেখ করেন, বাংলাদেশ বর্তমানে জনমিতিক লভ্যাংশকাল অতিক্রম করছে। আর মোটামুটি ১৫ বছর পর্যন্ত আমরা এ সুযোগটা পাব। এরপর বয়স্ক জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বাড়তে থাকবে, নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। আজকের শিশুদেরই সেই বয়স্ক জনগোষ্ঠীর দায়িত্ব নিতে হবে। সেটি করতে হলে তাদের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য সক্ষম করে গড়ে তোলার উদ্যোগ নিতে হবে। এক্ষেত্রে শিক্ষা ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান যে বৈষম্য পরিলক্ষিত হচ্ছে তা বড় ধরনের অন্তরায় সৃষ্টি করবে। এ বিষয়ে তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা ভর্তি

হচ্ছে, তাদের মধ্যে যারা পিছিয়ে পড়া অঞ্চল বা জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত তারা অনেক ক্ষেত্রেই বঞ্চিত হচ্ছে।

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, নাগরিক প্ল্যাটফর্ম দেশে এসডিজি বাস্তবায়নের জন্য কাজ করছে। এর ১৭টি অভীষ্ট পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, অন্য ১৬টি অভীষ্ট বাস্তবায়নে এসডিজির অভীষ্ট-৪-এর অভিঘাত সরাসরি ভাবে পড়ছে। এ অভীষ্টে মানসম্মত শিক্ষার কথা বলা হয়েছে। কাজেই মানসম্মত শিক্ষা ছাড়া এসডিজি অর্জন করা সম্ভব হবে না। তিনি বলেন, রাজনীতিবিদরাই আমাদের জাতীয় আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করেন। শেষ বিচারে তাদের কাছেই আমাদের যেতে হয়। সেখানে যদি জবাবদিহিতা, স্পষ্টতা ও সুশাসন নিশ্চিত করা হয়, তাহলে এক ধরনের বাংলাদেশ আমরা পাব। আর যদি সেটির অভাব হয়, তাহলে সমাজে বৈষম্য আরও বাড়তে থাকবে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নিরিখে কেবল অর্থনৈতিকভাবে উন্নত বাংলাদেশ নয়, বরং একটি সামগ্রিকভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে হলে শিক্ষা ব্যবস্থায় ও শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় আমাদের অনেক কাজ করতে হবে।

সভাপতি
ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য
সম্মাননীয় ফেলো, সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) এবং আহ্বায়ক, এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

প্রারম্ভিক বক্তব্য
জনাব আখতারুজ্জামান
সদস্য, নির্বাহী পরিষদ, ইকো-সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)

মূল প্রতিবেদন উপস্থাপক
জনাব তৌফিকুল ইসলাম খান
সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, সিপিডি

সম্মানিত আলোচক
জনাব মণিশংকর দাশ গুপ্ত
সহযোগী অধ্যাপক (বাংলা বিভাগ), নীলফামারী সরকারি কলেজ
জনাব জাহানারা রহমান ডেইজি
সহ-সভাপতি, সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক), নীলফামারী

সম্মানিত অতিথি
বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব তবিবুল ইসলাম
চেয়ারম্যান, ডিমলা উপজেলা, নীলফামারী

বিশেষ অতিথি
জনাব নবেজ উদ্দিন সরকার
জেলা শিক্ষা অফিসার, নীলফামারী

সমাপনী বক্তা
অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান
সম্মাননীয় ফেলো, সিপিডি এবং কোর গ্রুপ সদস্য, নাগরিক প্ল্যাটফর্ম

ব্রিফিং নোট প্রস্তুত করেছেন : মোঃ মাসুম বিল্লাহ্
সিরিজ সম্পাদনায় : অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান
সহযোগী সম্পাদক : অভ্র ভট্টাচার্য

সহযোগিতায়

Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh
এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

Eco-Social Development Organization (ESDO)